বুশের সফর

বন্ধু খুঁজতে ইউরোপে

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

কয়েকশ বছর আগে হলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের সর্বসাম্প্রতিক ইউরোপ সফরকে কোনো মহারাজের গজগমন বলে চালিয়ে দেয়া যেত। বিপুল লোকলস্কর, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আর মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে বুশের হাই-প্রোফাইল সফরটির অবশ্য বিশেষণের ঘাটতি হচ্ছে না। সবচে' আকর্ষণীয় শিরোনামে দিয়েছে বিবিসির একজন ভাষ্যকার। তিনি একে উল্লেখ করেছেন 'ফেন্স মেন্ডিং' (Fence Mending) বা 'বেড়া মেরামতের' সফর হিসেবে।

বিশেষণটি কৌতূহলোদ্দীপক। তারচে' বেশি কৌতূহলের ব্যাপারটি হচ্ছে সফরটির উদ্দেশ্য। সাম্প্রতিক অতীতে অন্য কোনো মার্কিন রাষ্ট্রপতি এত ঘটা করে ইউরোপীয় দেশসমূহ সফর করেননি। করেননি, কেননা করার প্রয়োজন পড়েনি। আসলে আটলান্টিকের দুই তীর কখনোই এতটা বিভক্ত ছিল না যতটা বিভক্তি দেখা দিয়েছে প্রেসিডেন্ট বুশের মেয়াদকালে। ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি দেশে বুশ ব্যক্তিগতভাবেও অজনপ্রিয়। ইরাক যুদ্ধের শেষে বুশ আরো একবার ইউরোপ সফরে গিয়েছিলেন। সে সময় প্রখ্যাত 'নিউজউইক' সাময়িকীর 'ইউরোপ কি তাকে (বুশ) ঘৃণা করে' শীর্ষক প্রতিবেদনের জরিপে দেখা যায়, মহাদেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বুশকে বিশ্বশান্তির জন্য হুমকি মনে করে। শুধু ইরাক ইস্যু নয়, বুশের আমলে সামগ্রিকভাবে মার্কিন বিদেশনীতি আগ্রাসী রূপ নিয়েছে যা ইউরোপের দেশসমূহ বিশেষত ফ্রান্স এবং জার্মানি ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। ফলে বিবিধ ইস্যুতে মতবিরোধ বেড়েছে। দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসে বুশ চেষ্টা করছেন সেই মতবিরোধের একটা সমাধান করতে। আটলান্টিকের দুই তীরের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে। এটাই এবারের সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য। অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট বুশ ইউরোপে এসেছেন বন্ধু খুঁজতে।

সফরের শুরুতেই ইউরোপের প্রতি বুশ একটি উদাত্ত আহ্বান রেখেছেন- 'আসুন একসঙ্গে কাজ করি' (lets be partners)। গোয়ার্তুমি তার সহজাত হলেও এবার তিনি বিভিন্ন ইস্যুতে ইউরোপের সংবেদশীলতাকে আমলে নিয়েছেন। বুশের সফরের দিনকতক আগে নয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'কনডি' রাইস মহাদেশটি ঘুরে গেছেন। সে সময় রাইস বুঝতে পেরেছিলেন বরাবরের মতো হামবড়া ভাব ধরে থাকলে যুক্তরাষ্ট্রকে চিরটাকাল একলাই চলতে হবে। ইউরোপের মতামতের প্রতি নমনীয়তা তাই বুশের সফরের প্রধানতম দিক। যদিও সফরের শুরুতে বুশ যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে 'বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতা এবং শান্তি' ছড়িয়ে দেয়ার স্বভাবসুলভ আহ্বান জানাতে তিনি ভোলেননি। বুশ তার ভাষণে ২৫ বার 'স্বাধীনতা (Freedom) এবং ৫ বার 'মুক্তি' (Liberty) শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ইউরোপ কতটা আগ্রহের সঙ্গে তার আহ্বানে সাড়া দেবে সেই ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। কেননা বিশ্বব্যাপী 'স্বাধীনতা' এবং 'শান্তি' ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বুশের পছন্দ চাপ প্রয়োগের নীতি। পক্ষান্তরে ইউরোপ চায় আলোচনা এবং যুক্তি।

কিছু ব্যাপারে দু'পক্ষ কাছাকাছি এসেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন- ইরাকে সাহায্যের ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে রাজি

BD‡iv‡c eÜz LyR‡Z G‡m ek †hgb 0kÎ"‡`i mv‡\_ nvZ wgwj‡q‡Qb †Zgwb eÜz cvKv K‡i‡Qb wgÎ‡`i mv‡_

হয়েছে। অন্যদিকে বুশ হাত মিলিয়েছেন ইউরোপে তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসি প্রধানমন্ত্রী শিরাক এবং জার্মান চ্যান্সেলর শ্রোয়েডারের সঙ্গে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, দেশ দুটি বৈরিতা ভুলে নিজেদের স্বার্থেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাককে বিশ্বের 'নবীনতম গণতান্ত্রিক দেশ আখ্যা দিয়ে দেশটির স্থিতিশীলতার জন্য ইউরোপের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

মধ্যপ্রাচ্যের মতো স্পর্শকতার ইস্যুতেও বুশ এবার নমনীয়তা দেখিয়েছিল। ইউরোপ বরাবর প্যালেস্টাইনিদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগও তুলেছেন কোনো কোনো ইউরোপীয় নেতা। এবারের সফরে ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন সংকট নিয়ে বুশকে নরম সুরে কথা বলতে দেখা গেছে। তিনি বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির সম্ভাবনা এখন নাগালের মধ্যে। বলেছেন স্বাধীন প্যালেস্টাইনের কথা। একই সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ভূ-খন্ডে প্যালেস্টাইনিদের বিভক্ত না করার জন্য তিনি ইসরায়েলকে সতর্ক করেছেন। অন্যদিকে ইরানের ব্যাপারে যুদ্ধে না যাবার কোনো প্রতিশ্রুতি না দিলেও বুশ বলেছেন ইরান ইরাক নয়। ইরানের পরামাণু সংকট সমাধান করতে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানির উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ওয়াশিংটনের তরফে বাণিজ্য সুবিধা দানের কথাও বুশ আলোচনা করেছেন। এভাবে বুশ চেষ্টা করেছেন ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতপার্থক্য কমিয়ে আনতে।

সফরের শেষ পর্যায়ে বুশ মিলিত হয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে। তার আগে বুশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মস্কোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বুশ পুতিনকে সম্ভবত অতীত স্মৃতি ভুলে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা স্বীকার করে নেয়ার ইঙ্গিতই দিয়েছেন। অন্যদিকে রাশিয়া এখন অনেক বেশি প্রাচ্যমুখী। সন্ত্রাসবাদের মতো কিছু অস্পষ্ট ইস্যুকে সামনে রেখে মস্কো-ওয়াশিংটন কাছাকাছি আসার ইঙ্গিত দিলেও এটা নাটক বৈ কিছু নয়। যদিও এই নাটকের গুরুত্ব অনেক। কেননা ইউরোপের রঙ্গমঞ্চে বুশ এবার যে 'ভালো মানুষের' পাট করলেন, তাতে বোঝা যায়, মিত্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্র কতটা মরিয়া। 'একলা চলো' নীতি মানতে গিয়ে সুপার পাওয়ার যে সুপার বেবিতে' পরিণত হতে চলেছে, বুশ একথা অনুধাবন করতে পেরেছেন। কথায় বলে, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস। ইউরোপের 'সৎ' মিত্রদের সংস্পর্শে যদি বুশের মতি ফেরে, তাহলেই এবারের ইউরোপ মিশন সর্থক। নচেৎ নয়।

একনজরে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে বিভক্তি

ইরাক

ইউরোপের অধিকাংশ দেশ ইরাকে মার্কিন যুদ্ধ এবং দখলদারিত্বের বিরোধী। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র চায় সবকিছু নতুনভাবে শুরু করতে। ইউরোপীয়রা যেন ইরাকের নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়। ফ্রান্স ও জার্মানি স্বীকার করেছে, ইরাকে নির্বাচন একটি অগ্রগতি। তবে তারা চায় মার্কিন সেনা প্রত্যাহার।

ইরান

সাময়িকভাবে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের আলোচনার উদ্যোগকে সমর্থন যোগাচ্ছে। যদিও আলোচনার ফলাফলের ব্যাপারে সন্দিহান ইউরোপ কঠোরভাবে যেকোনো সামরিক অভিযানের বিরোধী।

প্যালেস্টাইন/ইসরায়েল

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ উভয়েই সাম্প্রতিক শান্তি আলোচনার সমর্থক। কিছু ইউরোপীয় দেশ অবশ্য মনে করে গাজা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার পর্যন্তই ইসরায়েলের উদ্যোগ। পাশাপাশি ইসরায়েলের বিতর্কিত দেয়াল নির্মাণের বিরোধী ইউরোপ। ইউরোপ মনে করে যুক্তরাষ্ট্র অতিমাত্রা ইসরায়েলের প্রতি নমনীয়।

ন্যাটো

ন্যাটো সদস্যরা ইরাকি সৈন্যদের প্রশিক্ষণ ও আফগানিস্তানে শান্তি কার্যক্রমে অংশ নিতে রাজি। কিন্তু আটলান্টিকের দুই তীরের ভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণে ন্যাটো কতটা ভূমিকা রাখতে পারে তা অনিশ্চিত। সম্প্রতি জার্মানি ন্যাটোর নীতি সংস্কারের ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করেছে।

চীনে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা

ইউরোপ চীনে অস্ত্র বিক্রির নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে আগ্রহী। যুক্তরাষ্ট্র এর ঘোর বিরোধী। ওয়াশিংটন মনে করে এর ফলে তাইওয়ানের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। এবং উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় শক্তির ভারসাম্য বিনষ্ট হবে।

অন্যান্য ইস্যু

কিয়োটো চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক অপরাধী আদালতের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের অসহযোগিতায় ইউরোপ ক্ষুব্ধ।